Vol. 18 | No. 1 | 1974

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মুকুন্দরামের কাব্যে শ্রেণীচরিত্র

Volume	18
Issue	1
Year	1974
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Nilima Ibrahim
Published online	June 1, 1974
DOI	10.62328/sp.v18i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v18i1.4
Pages	50-67
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মুকুন্দরামের কাব্যে শ্রেণীচরিত্র

নীলিমা ইব্রাহিম

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন সুদক্ষ রূপকার ও বাস্তব জীবনশিল্পী রূপে পরিচিত। তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত যুগাগ্রগামী জীবন-ভাবনা তাঁকে বিশেষ শিল্পীমর্যাদা দান করেছে।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর মঙ্গল কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল'। এই নামটি তিনি তাঁর কাব্যের ভেতর বার বার ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'রূপে।

মুকুন্দরামের আত্মজীবনী থেকে জানা যায় তিনি বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের রাজত্ব কালে দেবীর স্বপ্নাদেশে তাঁর কাব্য রচনা করেন। রঘুনাথের রাজত্বকাল ১৫৭৩—১৬০৪ খ্রীস্টাব্দ। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ মুকুন্দরামের কাব্য সমাপ্ত হয়। কারণ ১৬০৪ খ্রীঃ রঘুনাথের পুত্র চক্রধর রাজা হন এবং কাব্যে তাঁর নামোল্লেখ নেই। অতএব তার জন্মের পূর্বেই কাব্য সমাপ্ত হয়েছিল এমন অনুমান অন্যায় নয়।

কবি লিখেছেন ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে তিনি গৃহত্যাগ করেন :

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজ ভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ ঔৎকল অধিপ।
যে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ ॥

মানসিংহ ১৮৫৭ খ্রীঃ বিহারের সিপাহসালার হন। ১৬৯০ খ্রীঃ তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। ১৫৯৪—১৬০৫ পর্যন্ত তিনি বিহার-বাংলা-উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন। সুতরাং মানসিংহের সুবেদারী কালে রঘুনাথের রাজত্বে ১৬০৩ খ্রীস্টাব্দের ভেতর মুকুন্দরাম তাঁর কাব্য রচনা শেষ করেন এ অনুমান সঙ্গত।

কিন্তু কবি নিজ আত্মজীবনীতে লিখেছেন তিনি মানসিংহের রাজত্বকালে দামুন্যা ত্যাগ করেছিলেন এবং রঘুনাথের রাজত্বকালে কাব্য রচনা করেছেন। এ দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান সহজ নয়।

রামজয় বিদ্যাসাগর সম্পাদিত চণ্ডীমঙ্গলে কাল নির্দেশক দু'টি ছত্র আছে :

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা ॥

রস অর্থ ছয় ধরলে ১৪৬৬ শতাব্দ অর্থাৎ ১৫৪৪ খ্রীঃ দেবী কবিকে স্বপ্নাদেশ দান করেন। রস অর্থ নয় ধরলে ১৪৯৯ শতাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দ হয়। ১৫৭৭ রঘুনাথের রাজত্বকাল। ডঃ সুকুমার সেন ১৫৪৪ খ্রীস্টাব্দকে কবির দেশত্যাগের তারিখ রূপে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে মানসিংহের রাজত্বকাল পাওয়া যায় না। সুতরাং কবির আত্মবিবরণীও আমাদের ব্যাখ্যায় সামঞ্জস্য সাধিত হয় না। পণ্ডিতদের ওপর সাল নির্ণয়ের দায়িত্ব অর্পণ করলে মুকুন্দরাম ষোড়শ শতাব্দীর কবি—সমাজ মূল্যায়নে এই সত্যই আমদের পক্ষে যথেষ্ট।

বর্তমান রচনার আলোচ্য বিষয় মুকুন্দরামের কাব্যে বিধৃত শ্রেণীচিত্র। বর্তমান কালে আমাদের সমাজ জীবনে শ্রেণীবিভেদ অর্থভিত্তিক। প্রাচীন হিন্দু সমাজ ছিল বর্ণভিত্তিক এবং বৃত্তিভিত্তিক। কবিকঙ্কণের কাব্যে আমরা উভয় ভিত্তির সংমিশ্রণ দেখতে পাই অর্থাৎ ধনভিত্তিক সামাজিক শ্রেণী এবং বৃত্তি ও জাতিভিত্তিক সমাজ।

মুকুন্দরামের আত্মজীবনী থেকে যদি শুরু করি তাহ'লে ভূস্বামী ও প্রজার জীবন দেখতে পাই। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিভীষিকা ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছিলেন কবি নিজে। দেবী-বন্দনার ছলে কবি আমাদের সামনে সে কালের বাংলাদেশের ভূস্বামী শাসনকে অমর করে গেছেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় বর্ধমানের রত্না নদীর তীরে দামুন্যা গামে কবির পিতৃপুরুষের বসবাস ছিল। কবির মৌলিক বৃত্তি ছিল কৃষিকাজ। সেলিমবাদ শহরবাসী গোপীনাথ নন্দী তালুকেই তিনি প্রজা ছিলেন। প্রজার পাপে অধর্মী রাজার রাজ-কর্মচারী ডিহিদার মাহ্মুদ সরিফের অত্যাচারে দেশের চরম অবস্থার বর্ণনায় কবি লিখেছেন :

উজির হলো রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পোনের কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥
সরকার হইল কাল খিল ভূমি লেখে লাল
বিনা উপকার খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥

পেয়াদা সবার কাছে প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা ॥

সুতরাং চণ্ডীবাড়ীর শ্রীমন্ত খাঁ, গম্ভীর খাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে কবি সপরিবারে দেশত্যাগ করাই সঙ্গত মনে করে পথে পা বাড়ালেন। পথের কণ্টকে কবি ভোলেননি :

তৈল বিনা কৈল স্নান করিলুঁ উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।
আশ্রম পুখরি আড়া নৈবেদ্য শালুক পোড়া
পূজা কৈনু কুমুদ-প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।

সুতরাং কবির কাব্যে বিধৃত গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ আমরা এভাবেই জানতে পারি।

মাহ্‌মুদ সরিফ তার প্রজাদের যে অত্যাচার করেছেন পশুদের মুখ থেকে কালকেতু সম্পর্কে ঠিক অনুরূপ অভিযোগ পশুরাজ সিংহের কাছে আনা হয়েছে। যে স্বৈরতন্ত্রের শিকার কবি নিজে হয়েছিলেন সেই মানবিক অনুভূতি ও সহানুভূতির দ্বারা তিনি পশুর দুঃখ বর্ণনা করছেন :

মহিষ আইল মুণ্ডে গলয়ে রুধির,
কহয়ে যতোন দুঃখ দেয় মহাবীর ॥
* * *
গণ্ডার কহয়ে আমি যত দুঃখ পাই,
খড়্গের কারণে মোর মরে দুই ভাই ॥
কপি বলে রায় মুই হইনু নির্বংশ।
কালকেতু বান্ধিয়া বেচিল মোর বংশ।
* * *
পতিহীনা হরিণী কান্দে উভরায়
রতি সুখহীন হৈল প্রাণ নাহি যায়।”

কবিকঙ্কণের কাছে কালকেতু ও মাহ্‌মুদ সরীফ একই গোত্রের। উভয়েই অত্যাচারী শোষক।

এই বর্ণনাতেই শেষ নয়। কবি ব্যাঙ্গ করেছেন শাষক গোষ্ঠীকে, বিদ্রূপের হূলে বিদ্ধ করেছেন তাদের পশুর মুখের সংলাপে :

উই চারা খাই আমি নামেতে ভালুক
নেউগী চৌধুরী নই না করি তালুক।

নেউগী চৌধুরীরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক। ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন ভালুকের জবানে।

কবিকঙ্কণ বস্তুবাদী কবি। দ্বিজ কবিবস্তু একই ধরণের অধিকারী। কবিকঙ্কণের বৈশিষ্ট্য তাঁর দক্ষতা বস্তুবাদেই সমাপ্ত নয় তিনি বাস্তব জীবন রসের কবি। জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণার চিত্রকে তুলে ধরেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তার অন্তর্নিহিত রসকে সহৃদয় হৃদয়ে সঞ্চারিত করে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

ব্যাধের সুখ-দুঃখ বর্ণনার সঙ্গে শিব-গৌরীর সুখ-দুঃখের ব্যবধানে নেই। অথচ ষোড়শ শতকের মানদণ্ডে একটি চণ্ডাল শ্রেণী, অপরটি দেবতা, কবিকঙ্কণ অর্থ-ভিত্তিক সমাজকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন ; কারণ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেও স্বয়ং কবিকে উঞ্ছবৃত্তি করতে হয়েছে। সুতরাং কুলমান অপেক্ষা ধনমানের গৌরব যে অধিক সে কালের বুকে দাঁড়িয়েও আজকের দিনের এ বাস্তব সত্যকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

দেবাদিদেব মহাদেব, বিয়ে করেছেন গিরিরাজ কন্যা গৌরীকে। তাঁদের গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রে পাই শিব ভিক্ষায় বেরিয়েছেন সম্বলের আশায় :

ফিরয়ে উজান-ভাটি চৌদিকে কোচের পটী
কোচ-বধূ ভিক্ষা দেয় থালে।
থালা হইতে চালগুলি পুরিয়া রাখেন ঝুলি
কান্ধেতে লম্বিত ঝুলি দোলে।
কেহ দেয় চাল কড়ি কেহ দেয় ডাল বড়ি
কুনী ভরি তৈল দেয় তেলী।
লবণিয়া দেয় লোণ ঘৃত দধি গোপগণ
বেন্যা দেয় 'ভাঙ্গের' পুটুলী ॥

সুতরাং মহাদেবের নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষা। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আজও আমাদের

সমাজ-জীবনের যে শ্রমবিমুখতা দেখতে পাই সে যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তা দেখি :

কালি ভিক্ষা কৈলু আমি ভ্রমি বহুধামে।
সকালে ভুঞ্জিয়া আজি রহিব বিশ্রামে ॥

একই সঙ্গে কাননে শিকার না পেয়ে কালকেতুর খেদোক্তি উল্লেখ করতে পারি :

'এথাই নরক স্বর্গ বলে ভাগবতে
নরক ভুঞ্জিতে কালু আইল মরতে
সুকৃতি পুরুষ জীয়ে সুখভোগহেতু
নরক ভুঞ্জিতে ক্ষিতিতলে কালকেতু ॥'

সুতরাং অর্থনৈতিক জীবনে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে দেবাদিদেব ও কালকেতু একই চক্র-পিষ্ট। এখানে মুকুন্দরাম দেব-মাহাত্ম্যমুক্ত মানবধর্মের কবি।

গৌরী এবং ফুল্লরার জীবনেও পার্থক্য নেই। কুলীন ঘর জামাই শিবের পত্নী গৌরী। পিত্রালয়ের বোঝা স্বরূপ, মা মেনকা ভর্ৎসনা করছেন :

তোমা ঝিয়ে হৈতে গৌরী মজিল গিরিয়াল।
ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কতকাল ॥
দুগ্ধ উথলিতে গৌরী নাহি দেহ পানি।
সখী সঙ্গে খেল পাশা দিবস রজনী।

* * *

রান্ধি বাড়ি আবার কাঁকাল্যে হইল বাত।
ঘরে জামাই রাখিয়া যোগাব কত ভাত ॥

গৌরী সবই বোঝেন। নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন :

উচিত কহিতে আমি সবাকার অরি
দুঃখ যৌতুক দিয়া বাপ বিভা দিল গৌরী।

কারণ তার ঘরের অবস্থা :

রন্ধন করিতে ভাল বলিলে গোঁসাই
প্রথমে যে দিব পাত্রে তা ঘরে নাই ॥
আজিকার মত যদি বান্ধা দেহ শূল।
তবে সে আনিতে পারি প্রভু হে তণ্ডুল ॥

ফুল্লরার অবস্থাও অনুরূপ :

ফুল্লরা বলেন বাসি মাংস না বিকায়
আজি বল মহাবীর সম্বল উপায় ॥
আছয়ে তোমার সই বিমলার মাতা
সেত্তাতিয়া ভেট লয়্যা তুমি যাহ তথা ॥
ক্ষুদ কিছু ধার নিবে সইয়ের ভবনে।
কাঁচড়া ক্ষুদের জাউ বাঁধিবে যতনে ॥

চণ্ডী যখন ফুল্লরার কুটিরে উপস্থিত হয়েছেন তখন ফুল্লরা তাঁর কাছে বার মাসের দুঃখ বর্ণনা করেছেন :

কিরাত পাড়াতে বসি না মেলে উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি যেবা সহে ভার ॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান
লঘু বৃষ্টি কুড়াতে সদাই বহে বান ॥

দেবতা ও মানব উভয়ের দারিদ্র্যের চিন্তাতেই আমরা কবিকঙ্কণের ব্যক্তিগত জীবনের অর্থকষ্ট জর্জরিত জীবনই দেখতে পাই।

মুকুন্দরামের শ্রেণী-চরিত্রের একটি উজ্জ্বল সৃষ্টি 'বণিক মুরারীশীল'। বাংলা-দেশে প্রবাদ আছে স্বর্ণ বেনে 'মায়ের কানের সোনা চুরি করে'। মুকুন্দরামের বেনেও চতুর চূড়ামণি, সে কুসীদজীবী। কালকেতু তার কাছে দেবীর দেওয়া অঙ্গুরি বিক্রী করতে এসেছেন। কালকেতুর সাড়া পেয়ে বেনে ঘরে লুকিয়েছে। কারণ 'মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি।' অতএব পাওনাদার থেকে দূরে থাকাই সমীচীন। ব্যান্যানী তার উপযুক্ত সহধর্মিণী। সুতরাং তিনি বললেন :

প্রভাতে তোমার খুড়া গিয়াছে ঘাতক পাড়া
কালি দিব মাংসের উদ্ধার।
আজি কালকেতু যাহ ঘর ॥

কিন্তু কালকেতু উত্তর দিলেন, 'অঙ্গুরী ভাঙ্গায়্যা নিব কড়ি।' মুহূর্তে ব্যান্যানীর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বেনেও অন্তরাল থেকে এসে হাজির হলেন। চতুর বেনে অঙ্গুরি দেখে বললেন :

'সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল।'

কালকেতু জানেন এর মূল্য সপ্ত ঘড়া ধন। সুতরাং তিনি এ আঙ্গটি বিক্রী করতে রাজী হলেন না। বেনে বললেন :

ধর্মকেতু ভায়া মনে কৈলু লেনা-দেনা।
তাহা হইতে ভাইপো হয়্যাছ সেয়ানা ॥
কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া
অঙ্গুরী লইয়া আমি যাব অন্য পাড়া ॥

দৈববাদী শুনলেন বেনে। দেবীর নির্দেশ পেয়ে মুহূর্তে বেনে আত্মসম্বরণ করলেন :

হৃদয়ে চিন্তিয়া বান্যা বলে মহাবীরে।
এতোক্ষণ পরিহাস করিলাম তোমারে ॥
সাত কোটি তঙ্কা নেহ অঙ্গুরীর ধন।
তবে অনুমতি দিলা ব্যাধের নন্দন।

কৌতুক মিশ্রিত জীবন অভিজ্ঞতা নিয়ে কবিকঙ্কন এ চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। আজও বৃহত্তম ব্যবসায়ী ক্ষুদ্রতম লাভের জন্য এমনিই লালায়িত হন। কবিকঙ্কনের হাতে এ ব্যবসায়ী চতুর বেনে প্রাণ পেয়েছে।

কবিকঙ্কণ অঙ্কিত অপর বাস্তব চরিত্র ভাঁড়ু দত্ত। ভাঁড়ু দত্ত মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী শ্রেণীর প্রতিনিধি। রাজা কালকেতুর দরবারে ভেট নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে ভাঁড়ু দত্ত বলেছে :

কহি যে আপন তত্ত্ব আমল হাঁড়ার দত্ত
তিন কুলে আমার মিলন।
দুই নারী মোর ধন্যা ঘোষ বসুর কন্যা
মিত্রে কৈল কন্যা সমর্পণ।

সুতরাং, ভাঁড়ু দত্ত অনুপযুক্ত নয়। অতএব :

আমি পাত্র রাজা তুমি আগে পূজা পাব আমি
পরিণামে ভাঁড়ুরে জানিবে।
দেহ মোরে সর্বভার তাড়বালা আদি হার
তুমি থাক নিশ্চিন্তে নিলয়।
বহু প্রজা বসাইব এত ছাইয়া পত্র লব
বন্দে বন্দে যেন প্রজা রয়।

সুতরাং পাত্ররূপে ভাঁড়ু দত্ত নিজেই নিজের নিয়োগপত্র গ্রহণ করলেন। এ চরিত্র আজকের সমাজে অভাব তো নেই বরং পূর্বাপেক্ষা সংখ্যাধিক্য দেখা যায়।

অতএব কালকেতুর সুদিন এলো। সবার ওপর পেষণ অত্যাচার চালিয়ে ভাঁড়ু নিজের উদর পূর্ণ করলেন। কিন্তু প্রজারা রাজার কাছে গোহারি করলেন। কৈফিয়ৎ চাইলেন :

'মহাবীর বলে ভাঁড়ু কি তোর ব্যাভার।
কি কারণে লোট হাট বাজার রাজার।
হিত উপদেশ বলি শুন ভাঁড়ু দত্ত,
আপনি রাখিলে রহে আপন মহত্ত্ব ॥

এ অপমান ভাঁড়ু দত্ত সহ্য করলেন না। অবিলম্বে কলিঙ্গ রাজসভায় উপস্থিত হলেন কালকেতুর গর্ব খর্ব করবার জন্যে। কলিঙ্গ রাজকে নিবেদন করলেন :

পূর্বে ভাণ্ডে পিত বারি   এবে ভেল হেমঝারি
বাটী ঘটী থালা হেমময়।
চড়ন পার্বত্য ঘোড়া   পরিধান খামা জোড়া
ঘর তার কুবের আলয় ॥

* * *

ভাঁড়ু দত্ত যত কয়   এক যদি মিথ্যা হয়
কর তবে প্রাণবধ দণ্ড।
কহি আমি হিতবাণী   মন দেহ নৃপমণি
কালকেতু হইল প্রচণ্ড ॥

ভাঁড়ু কৃতকার্য হলেন। কলিঙ্গরাজ যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। যুদ্ধে কালকেতু পরাজিত হল এবং ফুল্লরার নির্দেশে ধান্য ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করলো। এখানেও চতুর ভাঁড়ু দত্ত ফুল্লরাকে ছলনা করে কালকেতুকে কোটালের হাতে তুলে দেয়। মনিব বা কর্তা বদলে মধ্যবিত্তের ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট। আত্মসুখ তাদের কাছে সকলের ওপরে। অতএব পুরান মনিবের জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। একই রীতিতে কলিঙ্গরাজের দরবারে উপস্থিত হল ভাঁড়ু দত্ত। আবার তার ধ্বংসের পর অম্লান বদনে আবার কালকেতুর সামনে এসে মধুময় বাক্য উচ্চারণ করলেন ভাঁড়ু দত্ত। তবে কালকেতু নিম্নশ্রেণীর চরিত্র। ভাঁড়ু দত্তের আচরণের উচিত জবাব এবারে তিনি পেলেন।

পরবর্তী পর্যায়ে দেবীর আদেশে কালকেতু মুক্তি পেলো এবং কলিঙ্গরাজ কর্তৃক সমাদৃত হলা। তখন আবার কালকেতুর দরবারে এসে ভাঁড়ু দত্ত উপস্থিত হলেন :

তুমি খুড়া হৈলে বন্দী অনুক্ষণ আমি কান্দি
বহু তোমার নাহি খায় ভাত
দেখিয়া তোমার মুখ পাসরিলুঁ সব দুখ
দশ দিক হইল অবসাত।
হইয়া লোকের চূড়া সিংহাসনে থাক যুদা
আমারে রাজ্যের লাগে ভার।
থাকহ পুরাণ শুনি রাজ্য সব আমি জানি
নফরেরে করিবে বেভার।

কিন্তু কালকেতু সরল হলেও মূর্খ নয়। পুরাতন স্মৃতি ও অভিজ্ঞতায় কালকেতু এ স্তোকবাক্যে ভুললেন না। হুকুম দিলেন :

মুড়াহ ভাঁড়ুর মুণ্ড অভখ্যে পূরিয়া তুণ্ড
দুই গালে দেহ কালি চূণ।'

ভাঁড়ু দত্ত সুবিধাবাদী শ্রেণীর চরিত্র। তোষামোদের ভাষা ও ব্যবহার ভাঁড়ুর আয়ত্তে, অতএব হীনজাতি অশিক্ষিত কালকেতুর বিশ্বাস উৎপাদন করে নিজ স্বার্থে প্রজার ওপর অত্যাচার করতে তার অসুবিধা হয়নি বিবেকে আটকায়নি। মাহমুদ সরীফের ক্ষুদ্র সংস্করণ ভাঁড়ু দত্ত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভাঁড়ু কবিকঙ্কণের একক শিল্প সৃষ্টি এ চরিত্র আমাদের আকৃষ্ট করে, মুগ্ধ করে এবং এর নির্মাতার প্রতি শ্রদ্ধা জাগায়।

গুজরাট নগর পত্তনে মুকুন্দরাম কয়েকটি শ্রেণী-চরিত্রের অবতারণা করেছেন। অবশ্য এসব শ্রেণী বৃত্তি ভিত্তিক। নতুন নগর সৃষ্টি হয়েছে, বিভিন্ন প্রকার প্রজা আসছেন নতুন রাজার রাজত্বে বসবাস করতে। প্রত্যেকের উদ্দেশ্য সুখে-স্বচ্ছন্দ্যে বসবাস করা। বিভিন্ন বৃত্তিধারী, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে মুকুন্দরাম বাস্তব অভিজ্ঞতার রূপ-রেখায় চিত্রিত ও চিহ্নিত করেছেন।

প্রথম এলেন পাত্র পদপ্রার্থী ভাঁড়ু দত্ত। তারপর এলেন মুসলমান। এঁরা বাংলাদেশে নবাগত। এঁদের আচার ব্যবহার সাধারণ বাঙালী থেকে পৃথক। পল্লীর অধিবাসী মুকুন্দরামের এ বিচিত্র অভিজ্ঞতা থাকবার কথা নয়। সম্ভবতঃ বহুড়াবায়ের

রাজধানীরই বর্ণনা অমরা এখানে পাই। প্রথমেই কবি বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

'আইল চড়িয়া তাজি সৈয়দ মৌলানা কাজি
খয়রাতে বীর দেয় বাড়ি।
পুরের পশ্চিম পটি বোলয়ে হাসন্ হাটী
বৈসে কলিঙ্গ দেশ ছাড়ি ॥
ফজর সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাটি
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছোলেমানী মালা করে জপে পীর পেগম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ ॥
দশ বীর বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিত কেতাব কোরান।
কেহ বা বসিয়া হাটে পীরের শীরিনি বাঁটে
সাঁঝে বাজে দগড় নিশান।

এখানে কবিকঙ্কণ মুসলমানগণের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা ধর্মীয় জীবনের আচার-ব্যবহারের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। সম্ভবতঃ এখানেই হিন্দুসমাজের সঙ্গে ব্যবধান ছিল বেশী। কবির ধর্মনিরপেক্ষ অনাসক্ত অন্তর একটি সহজ কৌতুক দৃষ্টিতে এই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পর্যবেক্ষণ করেছে। নিজ সমাজ বা ধর্মীয় জীবন থেকে যেখানেই ব্যতিক্রম দেখেছেন কবিকঙ্কণ সে জায়গাটুকু যত্নের সঙ্গে এঁকে রেখেছেন :

করে ধরি খর ছুরি কুকুড়া জবাই করি
দশ গণ্ডা দান পায় কড়ি।
বকরি জবাই যথা মোল্লারে দেই মাথা
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি।

কবিকঙ্কণের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। জবাই রীতি হিন্দু সমাজে প্রচলিত নয়। কিন্তু নিরাসক্ত কবি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে শুধু শ্রেণী-চরিত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। ভাল-মন্দ বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। আজকের দিনে কবিকঙ্কণ এ কারণে আমাদের নমস্য। মুসলিম সমাজে সেকালেও পড়াশুনা সম্বন্ধে সচেতন ছিল :

যত শিশু মুছলমান তুলি দলিজ খান
মখদম পড়ান পড়না।

সেকালের মুসলমান সমাজেও বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণীবিভেদ ছিল। ইসলাম ধর্মে জাতিভেদ

নেই। এ কুসংস্কার থেকে এ ধর্ম মুক্ত। কিন্তু পরবর্তীকালে এই বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণী সমাজে অনেক ব্যবধান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। আজও কোনও সম্প্রদায়ের জোলা, তেলী, নিকিরি ইত্যাদি বলে হেয় দৃষ্টিতে দেখা হয়।

মুকুন্দরাম এখানে জোলা, মুকেরি, পিঠারি, কাবাড়ি, সানাকার, হাজাম, কাগজী, দরজি, বেনটা, রঙ্গরেজ, কসাই ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তিধারী মুসলমান শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এ শ্রেণীবিভেদ মুসলমান আগমনের খুব বেশী পরবর্তীকালের ঘটনা নয়। মনে হয় যেসব দেশ থেকে তাঁরা এসেছিলেন সেখানেও এ ধরনের বৃত্তি-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল। অথবা হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। কারণ হিন্দু শাস্ত্রের জাতিভেদ প্রথা অনতিবিলম্বে বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণী-ভেদে পরিণত হয়।

হিন্দু সমাজের অধিবাসীরা আহার শেষে আচমন করে ; মুসলমান সম্প্রদায় কাপড়ে হাত মোছে। এটুকুও কবিকঙ্কনের বাস্তব দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু এখানেও আছে সহজ কৌতূহল, উজ্জ্বল অনাবিল পবিত্র কৌতুক। কোথায়ও ঘৃণা বা বিদ্বেষ নেই।

কতো জাতি ও শ্রেণী আসছে নগর পত্তনের জন্যে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ , গোপ, বারুই, কুমার, তাঁতি, মালী, নাপিত, মোদক, গন্ধ বেনে, শঙ্খ বেনে ইত্যাদি সবাই এসেছে। কবিকঙ্কণ একে একে সকলের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। কায়স্থ আত্মপরিচয় দিচ্ছে :

প্রসন্ন সভারে বাণী লেখাপড়া সভে জানি
ভব্যজন নগরের শোভা।
অনেক কায়স্থ মেলা শুনিয়া তোমার লীলা
-আইনু তোমার সন্নিধানে।

চিকিৎসক বৈদ্য এসেছেন। কঠিন রোগী দেখলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন অনেক চিকিৎসকের ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই। মুকুন্দরাম তাঁর গভীর পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে দেখেছেন এ সমাজকে :

দেখিলে অসাধ্য রোগ পালাইতে করে যোগ
নানা ছলে মাগয়ে বিদায়।
কর্পূর পাচন করি তবে সে রাখিতে পারি
কর্পূরের করহ সন্ধান।
রোগী সবিনয়ে বলে কর্পূর আনিতে চলে
সেই পথে বৈদ্যের পয়ান।

দুষ্প্রাপ্য ঔষধের প্রেসক্রিপশন নিয়ে সারারাত দৌড়াদৌড়ি করে ডাক্তার না পাবার অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই আছে। তবে কবিকঙ্কণের বৈশিষ্ট্য নিছক হাস্যরস সৃষ্টি। ক্রোধ বা ক্ষোভের চিহ্নমাত্র এখানে নেই। তাঁর এ নিরাসক্ত দৃষ্টি আমাদের মুগ্ধ করে। ঋদ্ধিশালী নগরে সবাই এসেছে। অতএব :

‘লম্পট পুরুষ আশে বারবধূগণ বৈসে
এক ভিতে হইয়া অধিষ্ঠান।’

বিভিন্ন শ্রেণী চরিত্রকে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে অতি নিকট থেকে মুকুন্দরাম লক্ষ্য করেছেন এবং এই দৃষ্টিপাতের সঙ্গে জড়িত ছিল প্রতিটি চরিত্রের প্রতি কৌতূহল, মমতা ও সহানুভূতি। এ কারণেই চরিত্রগুলি এতো অধিক আবেদনশীল হয়েছে। আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে প্রতীতি জন্মেছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক কালকেতুও একটি শ্রেণী প্রতিনিধি। নীচ ব্যাধ জাতির সন্তান কালকেতু দারিদ্র্যপীড়িত লাঞ্ছিত মানবাত্মা। তার জীবনের একমাত্র কামনা উপযুক্ত শিকার পাওয়া এবং মাংস বিক্রী করে উদর পূর্তি করা। কালকেতুর আহারের বর্ণণায় তার অমার্জিত, অনাথ চরিত্রকে মুকুন্দরাম তুলে ধরেছেন। আসরে অভুক্ত, অর্ধভুক্ত শ্রোতার সামনে এক অতিরঞ্জিত ভোজন দৃশ্যের অবতারণা করে একদিকে তাদের কাল্পনিক তৃপ্তিদান করেছেন অপরপক্ষে কালকেতুর পাশব জীবন আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন :

চারি হাড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ
ধন ঘড়া নিয়া পাছে পালায় পার্বতী।
ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া
কচুর সহিত খায় করঞ্জা আমড়া।

* * *

শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিট্‌কাল
ছোট গ্রাস তোলে যেন তেয়াঁটিয়া তাল ॥

এ বর্ণনা আমাদের কৌতূহল বাড়ায়, অনাবিল হাসিতে উদ্ভাসিত করে কিন্তু ঘৃণার উদ্রেক করে না। তাই চারিত্রিক দৃঢ়তায় কালকেতু আমাদের বিস্ময়। অশিক্ষিত কালকেতু

বিবেক দ্বারা চালিত। ভাল-মন্দ সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা। নিজ কুটিরে দেবীকে দেখে বলেছে :

কহি আমি সত্য বাণী এই ঘরে ঠাকুরাণী
প্রবেশে উচিত হয় স্নান।
তেজিয়া ব্যাধের বাস চল বন্ধু জন পাস
থাকিতে থাকিতে দীন নাথে।

কিন্তু দেবী হিতকথা শুনতে রাজী নন। কালকেতু মিনতি করছে :

ছাড় এই স্থান মাগো ছাড় এই স্থান।
আপনি রাখিলে রহে আপনার মান ॥
বড়র বহুরী তুমি বড়লোকের ঝি
বুঝিয়া ব্যাধের ভাব তোয়ার লাভ কি।

কিন্তু দেবী নিরুত্তর। এবার দুষ্ট নারী সম্পর্কে কালকেতু চরম ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত :

এতেক বচনে যদি না দিলা উত্তর
ভানু সাথী করি বীর যুড়িলেক শর ॥

শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়ে কালকেতু 'জননী' সম্বোধন করেছে দেবীকে। কিন্তু নষ্ট চরিত্রের রমণীকে শরবিদ্ধ করতেও সে ইতস্ততঃ করেনি।

দেবী আত্মপরিচয় দিলেন, সাত ঘড়া ধন দিলেন আরও দিলেন বহু মূল্য অঙ্গুরীয়। শেষ পর্যন্ত অভয়ার কাঁখেও ধনের ঘড়া তুলে দিলেন কালকেতু। দিয়েও শান্তি নেই :

পশ্চাতে চণ্ডিকা যান আগে কালু যায়।
ফিরি ফিরি কালকেতু পাছ পানে চায় ॥
মনে মনে কালকেতু করেন যুকতি
ধন ঘড়া নিয়া পাছে পালায় পার্বতী।

অতি সাধারণ মানুষ, ততোধিক সাধারণ চিন্তাশক্তি। ফুল্লরা দেবীর সংবাদ আনলে কালকেতু তাকে বলেছে :

শাশুড়ি ননদ নাই নাহি তোর সতা
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা।

সকল বৃত্তান্ত শুনে বলেছে :

এ বোল শুনিয়া ক্রোধে বীর বলে বাণী
পরস্ত্রী দেখিয়ে যেন নিদয়া জননী ॥
ব্যক্ত করি রামা মোরে কহ সত্য ভাষা।
মিথ্যা হইলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা।

অতি সহজ, সরল, স্বচ্ছ অন্তরের কালকেতু। ঐশ্বর্যে বিকার নেই, দারিদ্র্যেও ভয় নেই।

পাশাপাশি ধনপতি সওদাগরের চরিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধনপতি বিত্তশালী ধনী। জীবন উপভোগের উপাচার তার কাছে সহজলভ্য। অতএব তিনি মুকুন্দরামের বিলাসী নায়ক। পায়রা উড়িয়ে আমোদ করেন, ঘরে স্ত্রী লহনা থাকা সত্ত্বেও শ্যালিকা ফুল্লনাকে দেখে মুগ্ধ হন, প্রণয় নিবেদন করতে চান। কিন্তু স্ত্রীর সমর্থন না পেলে শ্যালিকাকে ঘরে আনা সম্ভবপর নয় তাই পত্নীকে বলেছেন :

'রূপনাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে
চিন্তামণি নাশ কৈলে কাঁচের বদলে।
স্নান করি আমি শিরে না দেও চিরুনী
রৌদ্র না পায় কেশ শিরে বিন্ধে পানি।
* * *
মাসি পিসী মাতুলানী ভগিনী সতিনী
কেহ নাহি রহে ঘরে হইয়া রান্ধনী ॥

এমন সোহাগের বাক্যে কোন পত্নী না তুষ্ট হবেন। সুতরাং :

যুক্তি যদি লয় মনে কহিব প্রকাশি।
বন্ধনের তরে তব কর‍্যা দিব দাসী ॥
বরিষা বাদলেতে উনানে পাড় ফক।
কর্পূর তাম্বুল বিনা রসহীন মুখ।

অড়রার রাজ সভাকবি নিশ্চিত এ বিলাসী শ্রেণীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এঁদের প্রেমে নিষ্ঠা নেই, স্ত্রীর প্রতি সম্মান নেই। নারী দেহ লোলুপ আসক্তিই এদের কাম্য। শেষ পর্যন্ত নারী চিত্তের দুর্বল স্থানে আঘাত করে ধনপতি নিজের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করেছেন :

পরিতোষে লহনারে দিয়া পাট শাড়ী।
পাঁচ পল সোনা দিল গড়িবারে চুড়ি ॥

সাধু বলে প্রিয়ে তুমি আছ মম মনে।
যেমন আছিলা পূর্বে বিবাহের দিনে ॥
রত্ন পেয়ে যত্নে নিল লহনা যুবতী
বিবাহের তরে তবে দিলা অনুমতি।

এ চরিত্রের একটি দিক দেখিয়েই বর্ধিষ্ণু বণিক সমাজের চরিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

লহনা সহজ সরল নারী চরিত্র। দুই সতীনের ঘরের সংবাদ 'স্বয়ং চক্রবর্তী ঠাকুরও জানতেন'। এজন্যে ধারণা করা হয় মুকুন্দরামেরও একাধিক পত্নী ছিল। চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু কাহিনীতে ফুল্লরা দেবীকে বলেছে :

সতিন কোন্দল করে দ্বিগুণ শুনাবে তারে
কেন ঘর ছাড় হয়ে মানী,
কোপে কৈলে বিষ পান আপনি আনিবে প্রাণ
সতীনের কিবা হয় হানি।

কালকেতুও ফুল্লরাকে বলেছে :

শাশুড়ী ননদী নাহি, নাহি তোর সতা
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কইলি রাতা ॥

লহনা দেবীর আদেশ পেয়ে সতীন খুল্লনাকে বলেছে :

যে ঘরে নিবসে সতী অন্য কোন্দল তথা,
বৈর ভব না ভাবিও মনে।
যার সনে বার মাস একত্র করিবে বাস
অবশ্য কোন্দল তার সনে ॥

কিন্তু অবোধ মন প্রবোধ মানে না। প্রবাসী স্বামী ফিরে এসেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি যৌবনবতী সপত্নীর কাছে যাবেন। অতএব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। সহায় হ'ল দাসী দুর্বলা :

পতি আগমন বার্তা শুনি দূত মুখে।
দুর্বলারে বলে রামা বিষাদ কৌতুকে ॥

বর্ষ পরে প্রাণনাথ ঘরে এলো মোর।
খুল্লনার রূপ দেখি নুইবে বিভোর ॥
এড়িয়াছ কেনা মোর ঔষধ উপায়
প্রাণনাথে কর বশ হইয়া সহায় ॥

পান পড়া, পানি পড়া, মাদুলী তাবিজ ইত্যাদির সহায়তায় স্বামী বশ করার প্রয়াস আজও লুপ্ত হয়নি। কিন্তু ফুল্লনার নিন্দা, তার রন্ধন অপটুতার বিবরণ সবই ব্যর্থ হ'ল। শেষ পর্যন্ত স্বামীই তাকে বললেন :

চল ঘর ছাড়ি বাঁজি, চল ঘর ছাড়ি।
যদি নাই যাবি বাঁজি পাহুড়ির বাড়ি ॥

যে স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য এতো যত্ন, এতো প্রয়াস তিনিই শেষ পর্যন্ত তাকে বন্ধ্যা-রূপে ভর্ৎসনা করে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন। লহনা আক্ষেপ করেছে দুর্বলার কাছে :

দুয়া ঝাট আনি দেহ মোর সই।
পেচার অধিক ভীত   নিমের অধিক তিত।
এবে হৈনু বাস ঘরে মুই ॥
গিয়াছে যৌবনকালে   এবে সতীনের জ্বাল
তৃণসম আপনারে বাসি।
ঔষধ করিলুঁ যত   সে হইল বিপরীত
ঠাকুরানী হ'য়ে হইলুঁ দাসী।

শুধু বাস্তব চরিত্রই মুকুন্দরাম অঙ্কন করেননি। তার সমস্ত ক্রিয়াকলাপসহ অভাগিনী লহনা আমাদের অন্তরের সহানুভূতি আকর্ষণ করে, সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করতে ইচ্ছা হয়।

খুল্লনা চরিত্রটিও উপভোগ্য। সে ধনপতির শ্যালিকা—পরে দ্বিতীয় পত্নী—সুন্দরী শুধু নয়, সুচতুরা , সুরসিকা, পুরুষকে আকর্ষণ করবার রীতি তার জানা আছে :

ঈষৎ হাসিয়া রামা করে পরিহাস।
পারাবত হেতু সাধু তুমি ছাড় আশ ॥
আজিকার মত ছাড় মোর অনুরোধ।
আপনা আপনি সাধু করহ প্রবোধ ॥

প্রথমে সে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বা সপত্নীর আনুগত্য স্বীকার করেই নিয়েছিল, কিন্তু কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেও নিজে অধিকার সচেতন হয়েছে :

চুলাচুলি দোঁহে অঙ্গনেতে করে।
চেয়ে রহে সবে নিবারিতে নারে ॥

কিন্তু সতীনের সঙ্গে পেরে উঠলো না :

বড় বহুড়ী প্রবলা ছোটজন একেলা
কলহ নইল সেই দিন।
চক্ষে চক্ষে চাহিয়া রোষ যুতা হইয়া
খুল্লনা হইল স্বাধীন।

খুল্লনা অত্যন্ত চতুর। কাননে দেবী তাকে বর দিতে চাইলে সে পুত্রবর প্রার্থনা করবে কি পতির প্রত্যাগমন প্রার্থনা করবে এ দুয়ের একটি না ক'রে চাতুর্যের সঙ্গে বলেছে :

পুত্রবর মাগিব কি স্বামী নাহি ঘরে।
কি করিব বহু ধন আছয়ে ভাণ্ডারে।

সুতরাং স্বামীর প্রত্যাগমন ও পুত্রলাভ উভয় করে নাই সুকৌশলে দেবীর কাছে উপস্থাপিত করেছে।

কনিষ্ঠা সপত্নী হলেও স্বামী সৌভাগ্যশালিনী হবার জন্যে যে বুদ্ধি, কৌশল ও চাতুর্য প্রয়োজন খুল্লনার তা ছিল। যদিও কবি তাকে একান্ত শান্তশীলা করেই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

দাসী দুর্বলা রামায়ণের মন্থরার প্রতিরূপ।

অভয়ামঙ্গলের দুটি কাহিনী সমাজের দুইটি শ্রেণীর জীবনযাত্রার ওপর ভিত্তি করে রচিত। কালকেতু, ব্যাধ, ধনপতি বণিক। কিন্তু রচনার শিল্পচাতুর্যে কালকেতু উপাখ্যান অধিকতর শিল্পগুণসম্পন্ন। কারণ ব্যাধ সমাজের প্রতি কবিকঙ্কণের অধিক সহানুভূতি। দারিদ্র্যের লাঞ্ছনায় কালকেতু মুকুন্দরামের স্বগোত্রীয় তাই ফুল্লরার নিকট লহনা খুল্লনা নিষ্প্রভ।

মুকুন্দরামের কাব্যে শ্রেণী ভিত্তিক চরিত্র বিচার করতে গেলে যে মন্তব্য সবচেয়ে আগে করতে হয় তা হচ্ছে কাব্যকার দীনবন্ধুর মতো সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি কবির সম সহানুভূতি। এজন্য বানর আঁকতে চাইলে লেজ শুদ্ধই এঁকেছেন যেমন ভাঁড়ু দত্ত, খণ্ড ছিন্ন চরিত্র তিনি রূপায়িত করতে পারেননি। তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁকে

সুনিপুণ শিল্প কৌশল দান করেছে। দেবতা চরিত্র চিত্রণেও তিনি কল্পনানির্ভর হতে পারেননি। এ একদিকে তাঁর দুর্বলতা অন্যদিকে তাঁর গৌরব।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এমন করে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে কেউ ধরে রাখতে পারেনি। অভয়মঙ্গল কাব্য নয়। ঐ যুগের বাঙালীর জীবন ইতিহাস। রমেশ-চন্দ্র দত্তের উক্তি দিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি :

The thoughts feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with fidelity, which has no parallel in the whole range of Bengali literature.

সত্যিই তাই মুকুন্দরাম সৃষ্ট চরিত্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আপন মহিমায় আপনি উজ্জ্বল। কবিকঙ্কণের সহৃদয় হৃদয়ানুভূতি, ধর্মনিরপেক্ষ আর্দ্র চিত্ত, সহজ কৌতুকপ্রিয়তা তাঁকে অভাব, দারিদ্র্য, দুঃখ কষ্টকে জয় করে বাস্তব জীবনরসিক কবির সম্মানে উন্নীত করেছে। মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে এ কারণেই তিনি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক।